Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 67-71
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘মানুষ মানুষ’ বাস্তবিক অবয়বে প্রান্তিক নারীসত্তা

ড. সৌমিত্র নাথ

Abstract

The society on the whole treats women as commodities and objects of desire. It is clearly visible how the status of women has degraded in the eyes of their husbands and other members of family. Women are largely unsafe both within and outside the house. Throughout the world, a large scale commodification of the women's body has become the norm. The exploitation of women's body has been in practice since the ancient times and it continues till today. News of female assault and harassment of women reach us almost on a daily basis. In the present novel "Manush Manush" the author has sought to highlight such an exploitation of women at different levels in our society. The author has particularly drawn our attention to the workings of the women trafficking syndicate. The plight and misery of women who are subjected to this trade are one of the prime concerns of the novel.

Keyword: Violence against women, trafficking of women, Business of women's body, Family problems, sexuality, Human Rights.

সময়ের পালাবদলের সাথে সমাজ এবং সাহিত্যে সামাজিক চরিত্রগুলোর উত্থান-পতন, সুখ-সমৃদ্ধি পাল্টাতে থাকে। সময়ের বুকে আছড়ে পড়ে উত্তাল ঘটনা প্রবাহের নানা ঢেউ। মানুষগুলি কখনও অস্তিত্বের সঙ্কটে ক্ষতবিক্ষত হয় আবার কখনও সময়ের শোষণের জুয়ারে ভেসে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন ও নব্য পুঁজিবাদের প্রসারণ সর্বতোভাবে গৃহীত হয়। পৃথিবী এক নিষ্ঠুর বণিকবৃত্তিতে যুক্ত হয় তখন। এই অমানবিক পণ্যবৃত্তি পৃথিবীকে গ্রাস করতে শুরু করে। ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে ঘটিয়েছে ধর্মের প্রসার। বাণিজ্যের সুযোগে সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রয়াসই ছিল প্রধান। কারণ যত বেশি মেলবন্ধন তত বেশি ব্যবসা।এরকম এক অসহায়তার হাত ধরেই পণ্যবাজারের বিস্তার শুরু হল। বিত্ত সঞ্চয়ের নেশা ঢুকে পড়ল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও। মানুষ মনে করে চূড়ান্ত ভোগ মানেই চূড়ান্ত সুখ। যা ইচ্ছা তাই করতে পারার ক্ষমতা নর-নারীর মনে জায়গা দখল করতে থাকে। টাকা মানেই ক্রয় ক্ষমতা। টাকা যার দ্বারা সব কিছু কেনা যায় এমনকি গোটা মানুষও কেনা যায়।

বিশ শতকের শেষের দিকে আসতে আসতে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে পৃথিবী চোখের সম্মুখে ধরা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রণালীর তথ্যভাণ্ডারের সহজলভ্যতা মানুষের জীবন নির্বাহে নতুন মানদণ্ড প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। বিলাস ও প্রয়োজনের ভেদরেখা বিলীন হয়ে গেলে মানুষ নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধহীন হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে তারা পারিবারিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মানুষ মানুষ’(২০০৮) উপন্যাসে মানুষের মনের এই নতুন চিন্তাক্ষেত্রের হদিশ পাওয়া যায়। যেখানে এই সমাজ নারীকে ভোগ্য ও পণ্যবস্তুর

মতো ব্যবহার করেছে এবং আজও করছে। নারীরা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, যৌনতা ইত্যাদি নানা দিক থেকে শোষিত ।

'মানুষ মানুষ' (২০০৮) উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের মননের কঠোর সংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। ধর্মাচরণ, সামাজিক প্রথা এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কারপুষ্ট ধারণাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। তৎসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নারী পাচারকারীদের প্রতিও। সারা পৃথিবী জুড়ে রমরমা করে চলেছে নারী দেহ নিয়ে ব্যবসা, দিনদিন বাড়ছে এই নারী পাচার। আত্মজীবনীমূলক এ উপন্যাসে এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জড়িয়ে আছেন। সময়ের দিক থেকে এটি বিশ শতকের শেষ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সাবডিবিশনের মাইঝপাড়া গ্রামে। কিশোর বয়সেই কলকাতা এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম .এ পাশ করেন। তাঁর সাহিত্যের উপকরণ স্বভাবতই সংগৃহীত কলকাতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এছাড়া পূর্ববাংলার স্মৃতিবিধুর অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার একটি উৎস। তাই এ উপন্যাসে দুই বাংলারই লোকেদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা স্থান পেয়েছে।

উপন্যাসটি লেখা হয়েছে নারী জীবনের এক বিশেষ সমস্যাজনিত আঙ্গিকে। শামীম ও আনোয়ারার মূল কাহিনির সাথে যুক্ত হয়েছে মধুছন্দা, শ্রেয়া, নীলোফারের জীবনের সংযোজন। 'মানুষ মানুষ' এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন –

> *"বর্তমানকালে পশ্চিম বাংলা, কাছাকাছি কয়েকটি রাজ্য, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে বহু সংখ্যক নারী পাচার একটি তীব্র সমস্যা। এরকম একটি ঘটনার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম এবং সেই সূত্রে এরকম আরও আনেক ঘটনার নৃশংসতা ও আমানবিকতার পরিচয় পেয়ে শিহরিত হয়েছি। মূল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মর্মন্তুদ কাহিনিরও কিছু কিছু আভাস দিয়েছি।"* [১]

এই আনোয়ারা যার ডাক নাম মিতু, তার স্বামী ছেড়ে সৌদি আরবে যাওয়াকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ও কথক চরিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই চিন্তাগ্রস্ত। ঘরে বাইরে নারীরা সুরক্ষিত নয়। তিনি লিখেছেন –

> *"মিতুর শরীরে রূপ ও যৌবন আছে, মেয়েদের ওই শরীর লুট করার জন্য দস্যুরা ওঁত পেতে আছে যেখানে-সেখানে। এর মধ্যে এদেশ ওদেশের বিভেদ নেই।"* [২]

সামাজিক অবস্থায় নারী পরিসরের এই রূপ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শেষ দিকের বিবরণ। আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষেও নারীরা সুরক্ষিত নয়। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানোর পরও সমাজে সেই ভাবনা লালিত হচ্ছে। দুষ্কৃতিকারীদের নেই কোনো অপরাধবোধ।এরা মুখোশ পরে জনসাধারণের মধ্যে মিশে থাকে।তাদের জালে ধরা পড়ে সময়ে সময়ে সরল মনের মেয়েরা অথবা গৃহবধূ।নানান প্রলোভন তাদের কাজ করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এমন এক মেয়ের পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

> *"আমার পাশের মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। এক সময় সে হঠাৎ আমার কোটের হাতা চেপে ধরে খুবই ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে যা বলতে লাগল, অতি কষ্টে তার অর্থ উদ্ধার করা যায়। সে বলতে চাইছে, আমি যেন তাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাই, সেখানে সে যে কোনোও কাজ করতে রাজি। এমনকি বাসন মাজা, ঘর ঝাট দেওয়াও।"* [৩]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মেয়েটিকে আশ্রয় না দিলে ব্যাংককে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু অপরদিকে লেখককে ব্যাংককে নিষ্ঠুরের মতন পালাতে হয়েছিল। কারণ পরিস্থিতির চাপে আমরা কেউই এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না। সংবাদ পত্রের বাস্তবতা লেখকের দৃষ্টিতে –

> *"খবরের কাগজের জন্য এত টানের কোনও মানে হয় না। বেশিরভাগ দিনই তো খারাপ খবর থাকে। শুধু খুনোখুনি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ। আর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। প্রথম পৃষ্ঠায় যেন চটচটে রক্ত লেগে থাকে।*

তবু কাগজ পড়তেই হয়।"[৪]

বিষয়গুলো আজও পাল্টায়নি। নিছক মিথ্যে কথা না থাকলেও কথাকে অনেকের স্বার্থে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অথবা আসল সত্যকে বড় করে না দেখিয়ে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। এর মধ্যেও প্রতিদিন নারী নির্যাতনের খবর বাদ পড়ে না। বিবাহিতা নারীরাই এই নির্যাতনের বেশি শিকার। স্বামী গৃহেতো বটেই, পাচার হলে নারীরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয় আরও প্রচণ্ডভাবে। এর কিছু ধারণা এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

"মানুষের তো নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্যও সময়ের দরকার।"[৫]

আজ লেখকের পংক্তিটির অনেক প্রাসঙ্গিকতা আছে। যান্ত্রিক হয়ে পড়া মনুষ্যজাতির মধ্যে অন্যের সাথে মুক্ত আলাপের অবকাশতো নেই বটে, তার নিজের সঙ্গে সামান্য সংলাপও হারিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রচালিত এই সমাজে মনুষ্যজাতির বৃহৎ অংশ যন্ত্র দখল করে ফেলেছে, সে মোবাইল, কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ হোক, বা সত্য মিথ্যার আধারে তৈরি বিভিন্ন ছবি, এছাড়া বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল। এর ফলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হারাচ্ছে এবং মানুষে যন্ত্রের সম্পর্ক বাড়ছে ।এ অবস্থায় যন্ত্রযোগে নারী পাচারকারীরা অতি সহজেই নারীদের এই পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে নেয়, আবার কখনও স্বেচ্ছায় তারা সেই পথ বেছে নেয়। এর কারণ সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেছেন –

"দারিদ্র্য, অসুখী পরিবার, ক্ষীণ আশার হাতছানি আর তারপর দেওয়ালি পোকার মতো আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়া।"[৬]

বিভিন্ন রকমের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এসব মেয়েদের আটকে ফেলা হয়। সরল মনে এসব মেয়েরা সকল প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে এবং এদের ফাঁদে পড়ে। তখন এদের বিক্রি করা হয় পতিতালয়ে। এমনকি গৃহস্থালির কাজের জন্যও বিভিন্ন বাড়িতেও বিক্রি করা হয়। শুরু হয় অন্যায়, দুর্বিষহ অত্যাচার। এই নারী পাচারকারীদের সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে কোনও মিল নেই ।লেখকের মতে, এরা ছুরি-ছোরা, বন্দুক-পিস্তলের কারবার করে না, সঙ্গে কোনো অস্ত্রই রাখে না। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই এরা আস্তানা বদল করে, কখনও দুঃসাহসিক কোনও কাণ্ড করে না। চোর-ডাকাত, খুনি কিংবা রাজনৈতিক মস্তানদের সঙ্গেও এরা সম্পর্ক রাখে না বলে এদের চেনা বড় শক্ত। তাই নারী পাচার হয় নিঃশব্দে। বহু যুগ ধরে এই কারবার চলে আসছে।পুরুষশাসিত সমাজ সামাজিক এই সমস্যা নিয়ে বেশ মাথা ঘামায় না। এ নিয়ে মাঝে মাঝে তরঙ্গ উঠলেও অচিরেই তা মিলিয়ে যায়। বেশির ভাগই প্রমাণের অভাবে নারীদেহ লুণ্ঠনকারীদের আদালতে শাস্তি হয় না।

আইমা ও রহিমার জীবন দিয়েও সমাজে নারীর মূল্য বা গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন লেখক। অসহায় দুটি মেয়ে। মা মারা যাওয়ার পর পিতা তাদের শিয়ালদা স্টেশনে ছেড়ে চলে যায়। রানু মণ্ডলের মতো সুকণ্ঠ ও ভাগ্য সবারতো নেই। আইমা ও রহিমা ভিক্ষা করে আর রাত্তিরে স্টেশনে শুয়ে থাকে। ভিক্ষের সব টাকা সেখানে কোনো এক মাসিকে দিয়ে দিতে হয়। না দিলে সব টাকা কেড়ে নেয় আর মারধর করে। সেখানে তারা খেতে পায় দুবেলা। কয়েকমাস পরে আর তাদের দেখা যায় নি। লেখক উল্লেখ করেন-

"সম্ভবত তাদের শরীরে নারীত্বের চিহ্ন ফুটে উঠতে না উঠতেই কোনও অন্ধকার জগৎ তাদের টেনে নিয়ে গেছে।"[৭]

আনোয়ারা যে সৌদি আরবে গেছে, এক উদ্ধারাশ্রমে তার নাম শোনে উদ্ধার করতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেন এ সে আনোয়ারা নয়। এ এক অন্য আনোয়ারা যাকে এক যুবক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে এনে বিক্রি করে দিয়েছিল। মেয়েটিও লেখকের হাত ধরে টেনেছিল উদ্ধার পেতে। উদ্ধারাশ্রমে এসেও তারা কারাগারে বন্দিনীর মতো। সে পরিবেশ থেকে রক্ষা পেতে মেয়েটি কাঁদছে –

"... ও দাদা, আমাদের বাঁচান। আমারে বাড়ি পৌঁছাইয়া দ্যান। এহানে আমি বাঁচুম না! আমারে দয়া করেন।"[৮]

লেখকরা কোনো কথা না বলেই বেরিয়ে এলেন। এখান থেকে মেয়েটিকে বেরুতে হলে কেউ তাকে চিনে বলে সনাক্ত করতে হবে। এছাড়াও আদালতের নানান অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে পেরুতে হবে। আদালতের দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার জন্যও কেউ এ ব্যাপারে জড়াতে চায়না। পরিস্থিতিই বাধ্য করে চুপ করে থাকতে। সত্যিই আমরা কতোই না স্বার্থপর। কলকাতার কল-কারখানা বন্ধ, লক্ষ শ্রমিক বেকার, অনেকে খিদের জ্বালায় আত্মহত্যা করে তার মধ্যেও এই দেহ ব্যবসা বেড়ে চলে। লেখক দেখিয়েছেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ইসলামপুর , রায়গঞ্জ, ইংলিশ বাজার এসব জায়গায় নারী পাচারকারীরা খুব সক্রিয়। বাংলাদেশ থেকে এরা আনে সাতক্ষীরা, কুষ্টীয়া, রাজশাহী, হিলির মেয়েদের, অন্য জেলারও আছে। লেখকের মতে, যদি নিজের কোনো পরিজনদের কেউ এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তখনই চোখের সামনে খুলে যায় নরকের দরজা।

মেয়েদের জীবনে আরও কত রকম সমস্যা আছে তা পাওয়া যায় মধুছন্দার জীবন থেকেও। অনেক বিপত্তির মধ্যেও মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকতে হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। তাকে ঘিরে উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে কীভাবে পেশী শক্তির জোরে পুরুষ তার সঙ্গীটির ওপর অত্যাচার করে। জোর করতে পারে নারীর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে। পৃথিবীব্যাপী পুরুষ সেই আধিপত্যই চালিয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপর পুরুষের নিজের তৈরি এই সামাজিক নিয়ম। পুরুষের যৌনতৃপ্তিতে নারীর গর্ভে যে সন্তানটি আসে, সে একেবারে নির্দোষ কিন্তু সে যেন সমুদ্রে ভাসমান একটি প্রাণ। অনেক সময় সে তার পিতৃ পরিচয় জানে না। তার কোনো ভাষা নেই, ধর্ম নেই। সে জন্ম মুহূর্তেই অবাঞ্ছিত। তাকে গোপনে ফেলে দেওয়া হয় কিংবা মেরে ফেলা হয় গলা টিপে। কন্যা সন্তান হলে এই সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। গর্ভে থাকার সময়ও তাকে মেরে ফেলারও অনেক ষড়যন্ত্র চলে। আনোয়ারার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সমাজ তাকে গ্রহণ করতে চায় নি। সমাজে এরকমও দেখা যায় একই নারীর প্রতি আকর্ষিত একাধিক পুরুষ। এক্ষেত্রে কখনও নারীর প্রাণহানী ঘটছে আবার আত্মঘাতী হচ্ছে পুরুষও। উভয়ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা আর ট্রাজেডির অংশীদার নারীই। পুরুষেরাও সে ফল ভোগ করে। কিছু সংখ্যক পুরুষের বর্বরতায় লেখক লিখেছেন –

"...মায়ের পেট থেকেই যে তারা জন্মেছে, তাও মনে থাকে না?" [৯]

উপন্যাসে আনোয়ারাকে শামীম মেয়ে সমেত গ্রহণ করতে পারে না প্রথমে। সে অনিচ্ছাই প্রকাশ করেছিল, নইলে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারতো তার কাছে। তার খোঁজ খবর নিত। পরবর্তীতে সে নিতে চাইলেও আর আনোয়ারা ফেরেনি। শিশুটিকে আনোয়ারা পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল,কিন্তু প্রতিপদে তাকে অবজ্ঞাই পেতে হয়েছে। বিধবা নারীদের সমাজ গ্রহণ করছে কিন্তু আনোয়ারার মতো নারী যে স্বামী বর্তমানে পরিস্থিতির চাপে ছয়মাসের মতো সময় অন্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল আবার তাকে সমাজ মুক্ত মনে গ্রহণ করতে পারে না। সে জন্যে ঔপন্যাসিকের প্রশ্ন-

> *"...শকুন্তলা নিজে ছিলেন অবৈধ কন্যা, তাঁর ছেলে ভরতের জন্মও বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গে। কালক্রমে এই ভরত চন্দ্র বংশের রাজা হয়েছিলেন।... তাঁরই নামে প্রাচীন এই দেশটির নাম ভারতবর্ষ, এখনকার পাকিস্তান, বাংলাদেশ যার অন্তর্গত ছিল। অথচ এখন তিনটি খণ্ডেই জন্মের বৈধতা নিয়ে এত খুঁতখুঁতনি কেন?"* [১০]

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কোনো কুমারী মাতা যদি তার সন্তানকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তার প্রতি এই সমাজ খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। আগেকার দিনের চেয়েও আমরা যেন সংকীর্ণমনা হয়ে যাচ্ছি, হয়তো সভ্যতা একটা চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিল এখন শুরু হয়ে গেছে পতন। তাঁর মতে, প্রকৃত সভ্যতাই হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। কতরকম সামাজিক বিভেদে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই মানবাধিকার। আমাদের এই অধিকার বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের লড়তে হবে, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে আমাদেরই বিভিন্ন সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং বিভিন্ন অমূলক বদ্ধমূল ধারণার প্রতি। আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে মানববাদী চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে । উপযুক্ত মানববাদী শিক্ষার প্রসার আত্মচিন্তনমূলক ব্যবহারিক জ্ঞান মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে বাধ্য। সমাজে সর্বস্তরে এই নীতিবোধমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে । নিজের সাথে দেশ ও বিশ্বের কথা সকলের ভাবতে হবে।

তথ্যসূত্র-

১/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, পৃঃ- ভূমিকা
২/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ১৫
৩/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ১৯
৪/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ১৬
৫/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ,পৃঃ- ৪৭
৬/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ,পৃঃ- ৫৩
৭/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ৫৭
৮/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ৮৪
৯/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ২৯৩
১০/ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘মানুষ মানুষ’, অনুরূপ, পৃঃ- ৩২০